ঐতিহ্য ও পরম্পরা — সংস্কৃতির আলাপ-আলোচনা

অঞ্জন মিত্র

কলকাতার দুর্গাপুজো গতবছর "UNESCO Intangible Cultural Heritage for Humanity" স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার এ এক আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন। বাঙালি মাত্রেরই তেমন গর্বে ছাতি ছাপান্ন। আসলে অন্যলোকে না বললে, স্বীকার না করলে নিজেদের স্বকীয়তার বোধ জাগে না। তাই গতবছর কলকাতার দুর্গাপুজো হয়ে গেল স্বীকৃতির উৎসব। এই কারণেই কিঞ্চিৎ আত্মসমীক্ষার, বিশ্লেষণের প্রয়োজন, বোঝা দরকার সংস্কৃতির মূল্যবোধে ঐতিহ্য (Tangible Heritage) ও পরম্পরার (Intangible Heritage) গুরুত্ব। ঐতিহ্য বা Tangible Heritage-এর একটা ব্যবহারিক ধারাবাহিকতা আছে — যেমন বাড়িঘর, স্থাপত্য, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। যাকে ধরা যায়, কাজে লাগানো যায় ইত্যাদি — যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদের মধ্যে দিয়ে আমাদের অনুভব, উপলব্ধি ধরা পড়ে, আমাদের মননের প্রকাশ ঘটে। এটাই সংস্কৃতির পরম্পরা — তার অভিব্যক্তি। এটাকেই Intangible Heritage বলে ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্মীয় ভাবাবেগ, সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, শিল্পচর্চা, আচার-অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির পরম্পরা ব্যক্ত হয়। ফলে সংস্কৃতির মূল্যায়নে ঐতিহ্য ও পরম্পরা (Tangible ও Intangible Heritage) একে অন্যের পরিপূরক, অবশ্য অবলম্বন। ভারতীয় দর্শন অনেকটা পুরুষ-প্রকৃতির মত। একজন ধারক তো অন্যজন প্রক্রিয়া, স্থান ও অভিব্যক্তির মতো। একটু সরল করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ভারতীয় দর্শনে এই জীবন বোধের ভারি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। পুরুষ যদি সংস্কার হয় তবে প্রকৃতির ধারণা আসে নারীতে। হিন্দু দর্শনে হয়ত পিতৃতান্ত্রিক একটা ব্যাখ্যা আছে কিন্তু জৈবিক উপলব্ধির জায়গায় বা মননের প্রশ্নে এই জৈবিক রূপকের ধারণা আমাদের জীবনের জটিলতা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এটা ধ্যান ও ধারণার উৎপত্তি। ধ্যান — যা আমাদের সচেতনতা — যা বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বলে। অন্যদিকে ধারণা থেকে আসে উপলব্ধি। এই 'ধ্যান' হল পুরুষের সুচক, আত্মা-অন্তরের সত্য — আকারহীন, স্থির যা সহজে বদলায় না। পাশাপাশি 'ধারণা' হল প্রকৃতির দ্যোতক, যে অস্থির, সর্বদা পরিবর্তনশীল, সময়-স্থানের সঙ্গে তার পরিবর্তন ঘটে — সে অভিব্যক্তি সময়, স্থান অনুযায়ী যা বিবর্তিত তাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় Intangible Heritage বলে ব্যাখ্যা করি।

'UNESCO Intangible Cultural Heritage'-এর ধারণাটা এবার একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রথমত এটা একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন — যা আজও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এমন একটা চর্চা যার এক সামগ্রিক আবেদন আছে। এটি অবশ্যই একটা সামাজিক প্রকাশ।

ভারতবর্ষে এমন তেরোটি UNESCO স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিরাজমান। World Cultural Heritage sites in India-র এক ঝলক দেখলেই এই ধারণার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

১। 'কুম্ভমেলা' - প্রতি বারো বছরে এলাহাবাদ, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে মাঘ মাসে গঙ্গা, যমুনা, নর্মদার তীরের পবিত্র তীর্থে পুণ্যার্থীরা পুন্যস্নান করেন। লক্ষাধিক লোক, সাধু সমাগম হয় এই উপলক্ষ্যে। এই পুণ্যতীর্থে এক সাময়িক নগর তৈরি হয় এর আয়োজনে।

২। 'নওরোজ' - পার্সী নববর্ষ। বসন্তের এই উৎসব মার্চ মাসের ২০-২১ তারিখে পালিত হয়। এটি একটি প্রাচীন প্রথা — মূলত কাশ্মীরে, পারস্যে (ইরাক-ইরানে) এটি উদযাপিত হয়ে চলেছে।

৩। 'যোগ' - এটি একটি সনাতন ভারতীয় দর্শন। শরীর-মন-প্রকৃতির ভারসাম্যের এক ভারতীয় রীতি। যা আধ্যাত্মিকতা, সমাজদর্শন ও জীবনের উদযাপন। আজ সারা বিশ্বজুড়ে যার প্রভাব বিস্তৃত।

৪। 'ঝান্ডিয়ালা গুরুর থাঠেহারদের কুটিরশিল্প' — পাঞ্জাবের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তামা, পিতল ও অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে এক অত্যন্ত মৌলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রান্নার বাসনপত্র তৈরি করার পরম্পরা রয়েছে। এতে খাদ্যগুণ সযত্নে সংরক্ষিত হয়। এই শিল্প ঐতিহ্যকে ঘিরে এদের সমাজ সংস্কৃতির বিন্যাস।

৫। 'সংকীর্তন' - 'ভক্তিবাদ' ও 'বৈষ্ণব' ভাবনার প্রচারে এটি একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক রীতি। গান,

নাচ সহযোগে বিভিন্ন পুজো — উৎসবে অনুষ্ঠানের এক অবশ্য অঙ্গ। মণিপুর, বাংলা ইত্যাদি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন অঞ্চলের এ এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

৬। 'বৌদ্ধ স্তোত্র' - বৌদ্ধ দর্শনের পাঠমন্ত্র। আধ্যাত্মিকতা ও জনজীবনের পুণ্যার্থে এ উচ্চারিত হয়। সব ধরনের মাঙ্গলিক কাজে, ভাবনায় এটি বৌদ্ধ সমাজের অবশ্য প্রক্রিয়া।

৭। রাঢ় অঞ্চলের 'ছৌ' নাচ - রাঢ় অঞ্চল — পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার (মালভূম)-এর এক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। মূলত রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়বস্তু নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

৮। 'কালবেলিয়া' পরম্পরা (লোকগীতি ও নৃত্য) - রাজস্থানের এই লোক পরম্পরা এই অঞ্চলের মৌখিক সংস্কৃতি। এর একটা বিশেষ অভিব্যক্তি আছে। মূলতঃ কালো ঘাগরায় এই নৃত্যশৈলীর সর্পিল অভিব্যক্তি এক সামাজিক রীতি। 'পূঙ্গী' বলে এক বিশেষ কাঠের যন্ত্রানুষঙ্গের সঙ্গে এটি পরিবেশিত হয়।

৯। কেরালার 'মুদিয়েট্টু'- কেরালার গ্রামাঞ্চলের এটি একটি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, নৃত্যনাটিকার মাধ্যমে মন্দিরে, দেবালয়ে এর উপস্থাপনা করা হয়। এর বিষয়বস্তু মূলতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান ভিত্তিক।

দেবী 'কালী' ও অসুর 'দারিকা'র সংঘাত কাহিনি। বৈশাখের নতুন ফসল ওঠার উৎসবের এক অঙ্গ। কেরালার 'ছালাকুড্ডি', 'কূজা', 'পেরিয়ার', 'মুভাট্টুপুঝা' প্রভৃতি নদীর অববাহিকার গ্রামগুলোতে এর প্রচলন। সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের এক অনন্য ধারাবাহিকতা।

১০। 'রামম্' — চামোলি - উত্তরাখণ্ড, গাড়োয়াল হিমালয়ের সালান-ডোংরা গ্রামের এ এক ধর্মীয় উৎসব — যা এই অঞ্চলের লোকনাট্যের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়। লোকদেবী ভূমিয়াল এর প্রার্থনায় জটিল রীতি, আচার, গান, মুখোশ নৃত্যর মাধ্যমে যা পালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভূমিকা পালনে গ্রাম ঐক্যের, মূল্যবোধের পরম্পরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়।

১১। কুটিয়াট্টম - কেরালার নাট্যসংস্কৃতি — সংস্কৃতে এই নাট্যরীতি ভারতের প্রাচীনতম লোকধারা-আনুমানিক দু'হাজার বছর পুরনো এক ঐতিহ্য। এর কলাকুশলীরা ১০-১২ বছর অনুশীলনের পর পরিপূর্ণতা লাভ করেন। এর পূর্ণ উপস্থাপনা হতে প্রায় চল্লিশ দিন লাগে। এক এক দিনে একটা করে পর্ব — এর উপস্থাপনা হয় হিন্দু মন্দির 'কুট্টাপালাম' এ। রীতিমত গূঢ় এক প্রক্রিয়ায় রীতিনীতি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি বংশানুক্রমে সংরক্ষিত। তাই এর ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ।

১২। বেদাভ্যাস - প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর পুরনো এ এক একান্ত ভারতীয় দর্শন — যা মুলতঃ সংস্কৃতে রচিত পদ্য, গাথার মাধ্যমে রীতিনীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি — মৌখিক এক পরম্পরায় যুগে যুগে আবর্তিত এর ধারা। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মূলতঃ ব্রাহ্মণরাই এই পরম্পরার ধারক ও বাহক।

১৩। 'রামলীলা' - এটি উত্তর ভারতের এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। ষোড়শ শতকে তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস'-এর আখ্যানের বর্ণনা যা অনেকটা গীতিনাট্যের এক লোকধারা। অযোধ্যা, রামনগর, বেনারস,বৃন্দাবন, আলমোড়া, সাতনা, মধুবন অঞ্চলে প্রধানত এই উৎসবের প্রচলন আছে। রামের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে 'দশহরা'-র সময় এই লোকউৎসব ঘিরে গ্রাম, নগর জুড়ে এক গণউদ্দীপনা তৈরী হয়।

১৪। 'কলকাতার দুর্গাপুজো' - এই জনপ্রিয় উৎসবকে ঘিরে অধরা নাগরিক সাংস্কৃতিক ধারা।

১৫। এবং 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন' - এই দীর্ঘতালিকায় ২০২৩-এ নবতম সংযোজন।

দুর্গাপুজো দিয়েই নাহয় আরেকটু এগোই এই পথে। এখানে কলকাতা হল 'পুরুষ' এর সূচক, যে নিজের সংস্কৃতিতে তার পাড়ায় পাড়ায় এই দুর্গাপুজো উদযাপন করে। যারা এই উদ্যোগ নেয় সেই পাড়ার ক্লাবগুলো 'পুরুষ' এর মতো Tangible Heritage রক্ষার কর্তব্যে অবিচল। প্রতিবছর মোটামুটি একই জায়গায় এই দুর্গাপুজোর পুনরাবৃত্তি করে। সে ভাবেই গড়ে ওঠে পাড়ার 'দুর্গাপুজো'-য় প্রকৃতির মতো একটা ধারণা। অভিব্যক্তির ধারণায় অস্থির প্রতি পুজোয় নতুন মোড়ক। এ অনেকটা নারীসত্তার

মতো সুন্দর, চঞ্চল মনে একটা আবেশ তৈরি করে অল্প কিছুদিনের জন্য। একই সাথে পাড়ায় পাড়ায় তার বহু রূপের প্রকাশ — এই কারণেই সেটি Intangible Cultural Heritage of Humanity। পাড়ার উদ্যোগে তার Tangible Heritage থাকে নেপথ্যে।

কলকাতার দুর্গাপুজোর আরেকটা বিশেষত্ব আছে — তা হল এর অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন যা পরম্পরার সাংস্কৃতিক শর্ত বহন করেও আদ্যন্ত সাম্প্রতিক। তাই প্রতি বছরের কলকাতার পুজোর নাগরিক আবেদন অনন্য, এ এক অসাধারণ নাট্যমঞ্চ। প্রতিবছর চাই নতুন গল্প, নতুন ভঙ্গি, নতুন চমক। তাই এর আকর্ষণ দুর্নিবার। সঙ্গে পুজোকে ঘিরে আবর্তিত এক বাণিজ্য ব্যবস্থা — লক্ষ্য মানুষের রুজি-রোজগার। 'উৎসব' এখন এক প্রয়োজনীয়তা।

পাড়ার দুর্গাপুজোর একটা উদাহরণ দিই, তাহলে এই বক্তব্যের কারণের খানিক আন্দাজ পাওয়া যাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পশ্চিমে আর পরেশনাথ মন্দিরের দক্ষিণে অর্ধেক বস্তি আর অর্ধেক পাকা বাড়ির ফাঁকে সিমলা স্ট্রীটে (রাজা দীনেন্দ্রস্ট্রীটের শাখা এক রাস্তা) লালাবাগান নবাঙ্কুর ক্লাব । এখানে এই চিলতে রাস্তার অবকাশটুকুই তাদের অবলম্বন। এখানেই বছর বছর তারা দুর্গাপুজোর মণ্ডপ বানায় — এদের (Tangible) ধ্যান। ২০২১ সাল। কোভিড প্রক্রিয়ায় মাসখানেক আগে এই পুজো করার অনুমতি মিলেছিল শর্তসাপেক্ষে। এই জায়গায় তাই মাথা তুলে দাঁড়ায় এক সাময়িক মায়াকল্প — 'দর্পণ' — দুর্গাপুজোর ২০২১ সালের ধারণা — এই পাড়ার অনন্য অভিব্যক্তি — যা কলকাতার মানসে স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। 'দর্পণের' এক দর্শন আছে। দেবীর ধারণাকে বাস্তবে ধরতে আয়নার (দর্পণের) অবশ্য ভূমিকা আছে। এর মাধ্যমে দেবী প্রতিমা মৃন্ময়ী (মাটির তৈরি) থেকে 'চিন্ময়ী' হন। তাতেই তাঁর অধিবাস, মহাস্নান হয় — 'মা' কে ধরাধামে ক'দিনের জন্য কাছে পাওয়া যায়। এমন একটা ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে এ এক বিশেষ প্রক্রিয়া। এই জন্য মণ্ডপ জুড়ে আয়না আর সঙ্গে মাঙ্গলিক চিহ্ন ছড়ানো। দর্শনার্থীরাও এক বিশাল আয়নায় মায়ের অবয়বের হাজার ছবি প্রত্যক্ষ করেন — প্রত্যেকের স্থান অনুযায়ী এক একরকম অবয়ব। দেবীর এমন রূপকল্পে মোহিত হাজার হাজার দর্শনার্থী। মার বিসর্জন শেষে 'দর্পণ' আবার রূপান্তরিত হয় তার বছরভরের বাস্তবে।

২০২২ সালের দুর্গাপুজোয় লালাবাগান নবাঙ্কুর-এর এক নতুন উপস্থাপনা ''উৎসর্গ''। আবার এক সাময়িক রূপান্তর — জায়গাটা বদলে যায় এক উপজাতি গ্রামে। হারিয়ে যায় বিবর্ণ নগর ছবি। টানটান উত্তেজনায় পাড়ায় উদযাপিত হয় 'উৎসর্গ'। বড় বড় কড়াই-এ আনন্দযজ্ঞ, জীবনের সব কলুষকে মায়ের পায়ে 'উৎসর্গ' করে জীবনের জয়গান। আলো আঁধারি, রং-নিশান, প্রদীপের স্নিগ্ধতায় দেবী এখানে আবির্ভূত। আবার একবার এক অসাধারণ, অলৌকিক রূপকল্প — বড় মায়ায় ঘেরা এক স্মৃতি। নান্দনিকতায়, উপস্থাপনায়, অভিনবত্বে সে কলকাতাবাসীর কাছে অপূর্ব এক ছবি। বাস্তবতার যাবতীয় রুক্ষতা, কর্কশতার বাইরে নয়নাভিরাম এক মায়াময় জগৎ। এখানেই ঐতিহ্য ও পরম্পরা হাত ধরাধরি করে বাঙালি সংস্কৃতির উৎকর্ষ পৌঁছে দেয় দেশ সীমানার বাইরে গোটা বিশ্বে। এ আমাদের Tangible and Intangible Cultural Heritage — কলকাতার একান্ত নিজস্ব অনুভব। এখানেই ঐতিহ্য ও পরম্পরার হাত ধরে বাঙালি সংস্কৃতির একান্ত উপলব্ধি — এক মায়াময় স্মৃতি। দুর্গাপুজোর এমন নমুনা ছড়িয়ে সারা কলকাতায়।

উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে যাই।

কালীঘাট মন্দির কলকাতার আরেক প্রাচীন পাড়া। এই মন্দিরের দক্ষিণে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট। পুজোর উপস্থাপনায় এই রাস্তা প্রত্যেক বছর নজরকাড়া উদাহরণ রাখে। আদিগঙ্গার ঘাট থেকে পুবে সদানন্দ রোড এর বিস্তার। এই রাস্তায় পশ্চিমে অনেক ক'টা পুজো মণ্ডপ। তার প্রথমটাতে ঘাট ঘেঁষা নেপাল

ভট্টাচার্য স্ট্রীটের পুজো। স্থানীয় একটা ক্লাবই এখানের পুজোর উদ্যোক্তা। অনেকদিনের মধ্যবিত্ত বসতি — যদিও এখন নিম্নবিত্তদের ভিড়। বারো ফুট একটা রাস্তার উপর সারি সারি বাড়ি, সরু সরু গলি দিয়ে আবাসিকদের পথ। সব মিলিয়ে প্রায় চারশো ফুট লম্বা এই পরিসরটা জুড়ে এরা পুজোপ্রাঙ্গণ সাজায়। এর উপর মাঝে মধ্যে আদিগঙ্গার বান এই ছোট্ট রাস্তা ভাসায়। এত প্রতিকূলতার মধ্যে কি নাগরিক পরিসর গড়ে তোলা সম্ভব? এই অসম্ভবকেই এরা দুর্গাপুজোয় সম্ভব করে।

২০২১ সাল — কোভিড শর্তে পুজোর অনুমতি মিলেছিল মাস খানেক আগে। একটা পুরনো বাড়ির সামনে চিলতে খানেক ফাঁকা অবসর। মূল মণ্ডপ এখানেই তৈরি হয়। রাস্তাটা পুজোপ্রাঙ্গণ। চটজলদি থিম তৈরি হল — 'সিংহ দালান'। জমিদারের বাড়ির দুয়ার এই সিংহ দালান। কালীঘাট রোডের উপর তৈরি হল সিংহ দুয়ার — জমিদারদের পরাক্রমের ইঙ্গিত। আর চিলতে অবসর রূপান্তরিত হল বনেদী পুজোর দালানে। প্রতিমা জমিদারি ঘরানায়। গোটা রাস্তাটাই জমিদার বাড়ি। বাড়ির উঠোন, তার বাহ্যিক রূপ সবই এই মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে — একটা অপরূপ রূপান্তর। জমিদারবাড়ির ঐতিহ্য, পরম্পরার ইতিহাস এই নাগরিক পরিসরের পরতে পরতে। সম্ভ্রমে আপনি মাথা নুয়ে আসে — কোথায় গেল আটপৌরে সেই চিলতে রাস্তা।

পরের বছর, ২০২২ সাল। নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট আবার বদলালো। এবার সে 'শিলদ্রিজা'। পাথরের শিল কোটাই শিল্পীদের গ্রাম। তোরণে শিলকোটাই-এর নমুনা। একটা সময় বাঙালির রান্নাঘরে এই শিল-এর দেখা মিলত। ভাল করে মশলা তৈরি না হলে রান্নার স্বাদ আর আসবে কোথা থেকে? বাঙালি রুচির বড় পরিচয় সে — আজকের সমাজ তাকে মনে রাখেনি। যাদের হাত ধরে এই শিল্প তাদের জীবন-যাত্রা-ভাবনা, দেবীর ভাবনা নিয়ে এক অন্য রূপান্তর। খড়ের চাল, লোকশিল্পের আঙ্গিকে দেবী। সময়, কাল পার হয়ে শব্দে, আলোয় এক অপূর্ব কল্পলোক। এক অনন্য নাগরিক প্রেক্ষাপট-এ আমাদের Tangible and Intangible Cultural Heritage — কলকাতার একান্ত নিজস্ব অনুভব। এখানে ঐতিহ্য ও পরম্পরার হাত ধরে বাঙালি সংস্কৃতির একান্ত উপলব্ধি — এক মায়াময় স্মৃতি।

অঞ্জন মিত্র : স্থপতি। নগর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত।